

পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭খ্রি.-১৯৭০খ্রি.)

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়; জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ববাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে অর্থনৈতিক শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ অধ্যায়ে আমরা পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্পর্কে জানতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারব;
- আওয়ামী মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে রূপান্তরের কারণ এবং ১৯৫৮-পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব;
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক ছয় দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য') ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণ আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বর্ণনা করতে পারব এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ১.১ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই এই রাষ্ট্রের ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাম্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে বাঙালিদের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়,

তখনই বিতর্কটি পুনরায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে চৌধুরী খলীকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তমদুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ৬-৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত সংগঠনের যুবকর্মী সম্মেলনে 'বাংলাকে শিক্ষা ও আইন আদালতের বাহন' করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে, লেখালেখি শুরু হয়। ডিসেম্বর মাসেই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ঢাকা



চিত্র ১.১ : ভাষা আন্দোলনের মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মিছিল, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারিসহ সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর দাবি অগ্রাহ্য হলে ২৬ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। এ সংগঠন ১১ই মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এ কর্মসূচি পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল ও পিকেটিং করা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক ও অলি আহাদসহ উনসত্তর জনকে গ্রেফতার করা হয়। নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার জন্য প্রথম রাজবন্দিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেফতার নির্ধারতনের প্রতিবাদে ঢাকায় ১২-১৫ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দফাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বাংলা ভাষার প্রশ্নে গ্রেপ্তারকৃত সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হবে।
২. পুলিশি অত্যাচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।
৩. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।
৪. পূর্ববাংলার সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাওয়ার পর বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা হবে।

শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা।

৫. সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৬. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৭. ২৯শে ফেব্রুয়ারি হতে জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন 'রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই'-এ মর্মে মুখ্যমন্ত্রী ভুল স্বীকার করে বক্তব্য দেবেন।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কঠোর ঘোষণা করেন, ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও তিনি অনুরূপ ঘোষণা দিলে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং ‘না, না’ বলে তাঁর উক্তির প্রতিবাদ জানায়।

কাজ
দলগত : ভাষা আন্দোলনের
ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটের একটি চার্ট
তৈরি কর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিন্নাহর রেসকোর্স ময়দানের ঘোষণারও তাত্ক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। একপর্যায়ে পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বাঙালিরা এ অপপ্রয়াসের তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ভাষাকেন্দ্রিক যে আন্দোলন শুরু হয়, তা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয়ভাবে নিজেদের বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রভাষা উর্দু নয় বরং বাংলাকেই সমর্থন করে।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ৩০শে জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোও যুক্ত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং ঐদিন রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।



আব্দুস সালাম



আবুল বরকত



আবদুল জব্বার



শফিউর রহমান



শফিকউদ্দিন আহমেদ

চিত্র : ১.২ ভাষাশহিদ

ভাষার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। কারাবন্দি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি পালনে ছাত্র ও আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের ডেকে পরামর্শ দেন। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সহবন্দি মহিউদ্দিন আহমেদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে মহিউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দিদের মুক্তি ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারি সরকারি এক ঘোষণায় ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সভা সমাবেশ, মিছিল এক মাসের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের পাশে) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিক থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল এগিয়ে চলে। মিছিলের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ। সাথে ছিলেন ইডেন কলেজ, কামরুল্লাহ গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার গার্লস স্কুল হতে আগত ছাত্রীগণও।

পুলিশ প্রথমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে, মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ আরও অনেকে শহিদ হন। অনেকে আহত হন। ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশাল শোক র্যালি বের হয়। সেখানে পুলিশের হামলায় শফিউর রহমান শহিদ হন।

শহিদদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা মেডিকেল কলেজের সামনে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করে এবং শফিউরের পিতাকে দিয়ে ঐ দিনই তা উদ্বোধন করা হয়। ২৪ তারিখ পুলিশ উক্ত শহিদ মিনার ভেঙে ফেলে। ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ শীর্ষক প্রথম কবিতা রচনা করেন। তরুণ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ‘স্মৃতির মিনার’ কবিতাটি রচনা করেন। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন শহরে ছাত্র, যুবকসহ সাধারণ মানুষ ভাষার দাবিতে আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা পোষণ শুরু করে। এসব হত্যাকাণ্ড পূর্ব বাংলার জনগণের মনের ওপর বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবদুল গাফফার চৌধুরী রচনা করেন ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। সজীতশিল্পী আবদুল লতিফ রচনা ও সুর করেন ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’, এবং ‘তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি’র মতো সজীত। ড. মুনীর চৌধুরী জেলে বসে রচনা করেন ‘কবর’ নাটক। জহির রায়হান রচনা করেন ‘আরেক ফাল্গুন’ উপন্যাসটি। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা মূলধারার রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেয়।



চিত্র ১.৩ বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনার

১৯৪৭ সালে সূচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপ লাভ করে। ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস ও আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পঞ্চাশের দশকব্যাপী ছিল বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকাল। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এ দেশের মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তানি শাসনপর্বে এটি বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলন।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি আগে যে মোহ ছিল তা দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৫৩ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ‘শহিদ দিবস’ হিসেবে দেশব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে ফুল অর্পণ করে আমরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বাঙালি জাতির কাছে দিনটি গভীর শোকের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার দিন। কানাডাভিত্তিক বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিক গোষ্ঠীর সদস্য রফিকুল ইসলাম ও আব্দুল সালামের উদ্যোগ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদ দিবসকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ (International Mother Language Day) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পৃথিবীতে ৬০০০ এর বেশি ভাষা রয়েছে। এসব ভাষার মানুষ সেই থেকে বাংলাদেশের শহিদ দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের ভাষার মর্ম নতুনভাবে বুঝতে শিখেছে। আমাদের দেশে বাংলাভাষীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির নৃগোষ্ঠী রয়েছে। বর্তমান সরকার সকল নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে সচেষ্ট হয়ে মাতৃভাষায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

পরিচ্ছেদ ১.২ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র এবং একই সঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুলগুলো বুঝতে পারে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হওয়ার পরও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগসহ সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃত্ব শুরু করে। বাঙালি তথা পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে থাকে। তখন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে: ১. পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ইসলামি নামধারী রাজনৈতিক দল, যেমন-মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও নেজামে ইসলাম; ২. পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্যে সোচ্চার রাজনৈতিক দল, যেমন-আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এবং ৩. সাম্যবাদী আদর্শের বাম রাজনৈতিক ধারা।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে বাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলা হয়। ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল ও গণমানুষের নেতৃত্বে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ গঠন করা হয়। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরুরতাই দলটি বাঙালিদের স্বার্থে একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জনগণের সার্বভৌমত্ব, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, পাট ও চা শিল্প জাতীয়করণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ ইত্যাদির দাবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব দাবি উত্থাপনের কারণে দলটি দ্রুত পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকের রোষানলে পড়েন। তাই ১৯৪৯ সালে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কারাগারে বসেই তিনি ভাষার দাবিসহ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ফলে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে বন্দিজীবন কাটাতে হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ ছিল আওয়ামী লীগের। ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের অধিকতর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ এর নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’ করা হয়। ফলে ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদের ধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এ সময়ে দলটি পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল স্বার্থরক্ষায় একদিকে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে সংসদ ও প্রাদেশিক সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সোচ্চার হতে থাকে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন, প্রাদেশিক নির্বাচন ও সরকার গঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসক দল মুসলিম লীগ দীর্ঘদিন নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এছাড়া প্রাদেশিক সরকার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দল চারটি হলো: আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিক ছিল নৌকা। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আর মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। বাকি আসন অন্যরা পায়। নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার রায় প্রদান করে। পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের শাসন দেখতে জনগণ যে আগ্রহী, তা স্পষ্ট হয়। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের রায় লাভ করে। জনগণই যে ‘সকল ক্ষমতার উৎস’—এই নির্বাচন তা প্রমাণ করে। জনগণ এ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্ব বাংলায় এর শাসনের অবসান ঘটায়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব ও সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা হবে।
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং পাট কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।
৫. পূর্ব বাংলার লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও লবণ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির বাসতুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে।
৭. খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যনিয়ন্ত্রণ, কৃষিকে যুগোপযোগী করে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হবে।
৮. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত ও শ্রমিকের ন্যায় সজ্জাত অধিকার রক্ষা করা হবে।
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষকদের ন্যায় সজ্জাত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।
১০. শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সকল প্রকার কালাকানুন বাতিল ও উচ্চশিক্ষাকে সহজলভ্য করা হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য হ্রাস করা হবে।
১৩. সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে।
১৪. রাজবন্দিদের মুক্তিদান, বাকস্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হবে।
১৬. ‘বর্ধমান হাউস’কে আপাতত ছাত্রাবাস ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।
১৭. বাংলা ভাষার শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।
১৯. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
২০. নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
২১. পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। আদমজী পাটকল ও কর্ণফুলি কাগজের কলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছনে ঐ দাঙ্গা হয়েছিল। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে গৃহবন্দি করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈরী মনোভাব প্রকাশ পায়। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের অরাজক শাসন পর্ব শুরু হয়। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হতে থাকে। দেশ সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়।

কাজ
দলগত : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার
ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল
শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট অরাজকতা-
আলোচনার মাধ্যমে পক্ষে যুক্তি
উপস্থাপন কর।

পরিচ্ছেদ ১.৩ : সামরিক শাসন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠীর অশুভ তৎপরতার ফলে সংসদ ও সরকার কার্যকর ভূমিকায় থাকেনি। ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পরস্পরবিরোধী এমএলএদের মধ্যে মারামারির মতো এক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। এতে ডেপুটি সিকার শাহেদ আলী গুরুতর আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যান। এরই সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, ২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া, ৩. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা, ৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ ক'জন রাজনৈতিক নেতাকে জেলে প্রেরণ ও ৫. সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত ও দেশত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে যেসব পদক্ষেপ নেন তা হলো : ১. নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা, ২. পূর্ব ঘোষিত ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত করা, ৩. দুর্নীতি ও চোরাচালান দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত ও ৪. রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা।

সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের ভোটেই রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এটি ছিল পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার কাউন্সিল সদস্যের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সামরিক শাসনের ফলে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যসমূহ

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অগ্রসর ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনশাষণ প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকে। বৃন্দ পিছিয়ে থাকে দুই অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য।

কাছ

দলগত : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিল। ১৯৫৫-১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯-১৯৬০ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছিল মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। একইভাবে ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৪৮ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ছিল ২২,২৩০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো, তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে কয়েকগুণ পিছিয়ে পড়ে।

প্রশাসনিক বৈষম্য : পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল ব্যাপক। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান প্রশাসনের চিত্র ছিল নিম্নরূপ :

খাত	প্রেসিডেন্টের সচিবালয়	দেশরক্ষা	শিল্প	স্বরাষ্ট্র	তথ্য	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	আইন	কৃষি
বাঙালি	১৯%	৮.১%	২৫.৭%	২২.৭%	২০.১%	২৭.৩%	১৯%	৩৫%	২১%
পশ্চিম পাকিস্তানি	৮১%	৯১.৯%	৭৪.৩%	৭৭.৩%	৭৯.৯%	৭২.৭%	৮১%	৬৫%	৭৯%

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান প্রশাসনের চিত্র

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করেছিল। ১৯৫৬ সালে দৈনিক ডন পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বাঙালিদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল।

পদবী	জেনারেল	মেজর জেনারেল	ব্রিগেডিয়ার	কর্নেল	লেফট্যানেন্ট কর্নেল	মেজর	নৌবাহিনী অফিসার	বিমান বাহিনী অফিসার
পশ্চিম পাকিস্তান	৩ জন	২০ জন	৩৪ জন	৪৯ জন	১৯৮ জন	৫৯০ জন	৫৯৩ জন	৬৪০ জন
পূর্ববঙ্গ	০ জন	০ জন	০ জন	১ জন	২ জন	১০ জন	৭ জন	৪০ জন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এগিয়ে ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ লাভ করতে থাকে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

সামাজিক বৈষম্য : পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মধ্যবিত্তের বিকাশ মন্ডর হয়ে পড়ে। বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। মানুষ প্রতিবাদ করে। আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন : আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে বাঙালিদের প্রিয় নেতা ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ছাত্র সমাজ ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। শিক্ষানীতি বিষয়ক ছাত্রদের আন্দোলনে বিভিন্ন পেশাজীবীও অংশগ্রহণ করেন। এই সঙ্গে সাববিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠিত হয়। এই সংগঠন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসনবিরোধী বক্তব্য নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৬ দফার গটভূমি

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ অঞ্চলের সুরক্ষার কোনো গুরুত্বই ছিল না। ভারতের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে। ভারত সে সময় যদি পূর্ববঙ্গে ব্যাপক আক্রমণ চালাতো, তাহলে ১২শ মাইল দূর থেকে পাকিস্তান কোনোভাবেই এ অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারত না। এ সময় 'ইসলাম বিপ্লব', রবীন্দ্র সংগীতকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও নজরুল ইসলামের গানে 'হিন্দুয়ানির' অভিযোগ তুলে এসবের চর্চা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করে। উপরোক্ত ঘটনাবলী এবং আইয়ুব খানের নির্বীতন-নিগীড়নের গটভূমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেছিলেন।

৬ দফা : পূর্ব বাংলার মুক্তিসনদ

ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রবক্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গভীর ও সুশৃঙ্খলিত রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি সাংবাদ সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দফাগুলো হলো :

১. পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান।
২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।
৩. সারাদেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দু'ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।
৪. সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
৫. অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।
৬. অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।



চিত্র ১.৪: ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বান

পূর্ববঙ্গ : ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরে। আইয়ুব সরকার একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে গভীরভাবে উজ্জীবিত করে। এটি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণার জন্য পাকিস্তানি শাসকপোষ্টী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান সরকার ৬ দফা গ্রহণ না করে দমন-পীড়ন শুরুর করলে আন্দোলন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য')

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তার বিশ্বাস ছিল শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সে সময়ে গোপনে গঠিত বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্মতি দিয়েছিলেন। বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। পরিকল্পনাটির ব্যাপারে একবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তা ফাঁস হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ('রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য') দায়ের করে। শাসকগোষ্ঠী এটিকে ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে আখ্যায়িত করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ষড়যন্ত্র বলে মনে হলেও এটি ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর একটি পরিকল্পনা। এ মামলায় রাজনীতিবিদ, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় এক নম্বর আসামি। তাঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১(ক) ও ১৩১ ধারায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করার অভিযোগ আনা হয়। বিচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন এ মামলার শুনানি শুরু হয়।

মামলা শুরু হওয়ার পর তা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্র সমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার ঐক্যবান্ধ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে। ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ফলে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়, তারই ধরাবাহিকতায় 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' বাঙালিদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

এটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। আন্দোলনে যুক্ত হতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন। প্রদেশব্যাপী ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তখন রাস্তায় নেমে আসে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্য নেতৃবৃন্দকেও মুক্তি দেওয়া হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তদানীন্তন ডাকসুর ভিপি ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।



চিত্র ১.৫ : শহিদ আসাদ

গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রভাব : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান

পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পূর্বে তিনি 'ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা' তুলে নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নতুন সামরিক সরকার বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ এর মহান



মুক্তিযুদ্ধে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে এসব অর্জন সম্ভব হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তবে পাকিস্তানে ইতোপূর্বে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এই নির্বাচন নিয়েও নানা আশংকা ছিল। নির্বাচন বিষয়ে কোনো নিয়ম-কানুনও ছিল না। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। নির্বাচনে ৫ কোটি ৬৪ লাখ ভোটারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৩ কোটি ২২ লাখ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ববাংলার জন্য নির্ধারিত ১৬২ টি আসনের ১৬০ টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসন ৭টিসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনসহ মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ বিজয় ছিল নজিরবিহীন। আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় লাভ করে।

নির্বাচনের স্তরভূত : ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটি ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পিছনে নির্বাচনের অপরিণীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র দানে বিশাল ভূমিকা রাখে। পরিশেষে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

কাজ

একক : বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের একটি তালিকা তৈরি কর।